দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 9 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

দেশে বোধকরি লেখাপড়ার বিষয়টি সর্বমহল হইতেই সর্বাপেক্ষা অবহেলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে। একদিকে রাজনৈতিক তাপ-উত্তাপ, হরতাল ইত্যাদির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। অন্যদিকে আবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ বা উপাচার্য কিংবা কোন শিক্ষকের অপসারণের দাবিতে কিংবা দলবাজিজনিত অনাসৃষ্টির কারণে বিভিন্ন সময় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' এই আপ্তবাক্য আমরা সকলেই কপচাই বটে কিন্তু শিক্ষার জন্য প্রকৃত বা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা কেহই কোনপ্রকার দায়িত্ব পালন করি না। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম বরাবরই নানান প্রতিকূলতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। উপরে উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়াও ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার ব্যাপারে শিক্ষকদের যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা উহারও রহিয়াছে যাচ্ছেতাই ধরনের অভাব। শিক্ষাদান এক সময় পেশা হিসাবে বিবেচিত হইত না। শিক্ষা ছিল শিক্ষকদের নিকট ব্রত। তাই শিক্ষকরা সমাজে মানুষ গড়িবার কারিগর হিসাবে সমাদৃত ছিলেন। কিন্তু এখনতো আর সে 'রামও নাই সে অযোধ্যাও' নাই। তাই শিক্ষাও আজ অন্য দশটি পেশার মতই একটি পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে যদিও ক্ষতির কিছু নাই যদি না শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞান বিতরণে সত্যিকার অর্থেই নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য যে, শিক্ষকদেরকেও এখন সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি অনেকাংশে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রেও বর্তমান অবস্থা-দৃষ্টে এই কথার সত্যতা মেলে বৈকি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য যেমন শিক্ষক বা গুরুজন তেমনি আবার শিক্ষা উপকরণের সহজলভ্যতাও এক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাহাছাড়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়তো আছেই। গত মঙ্গলবার দেশের একটি নেতৃস্থানীয় দৈনিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান বেহাল দশার যে চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে উহাতে প্রমাদ না গণিয়া পারা যায় না। গ্রন্থকেন্দ্রটিতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তি পোহাইতে হইতেছে। এই ভবনটি যখন নির্মাণ করা হইয়াছিল তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ হাজার। কিন্তু বর্তমানে ঐ সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি হইলেও গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধাই বৃদ্ধি পায় নাই। প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৬৬০টি আসন রহিয়াছে সেখানে। অবিশ্য ঐ ২০ হাজার শিক্ষার্থীর সকলেই যে গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করেন এমন নহে। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষার সময় এতই চাপ বাড়ে যে, শিক্ষার্থীরা দীর্ঘক্ষণ লাইন ধরিয়া গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে এবং বসার ও পড়িবার ঠিকমত জায়গা পায় না। তাহাছাড়া কোন বিবেচনাতেই ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৬৬০টি আসন মানিয়া নেওয়া যায় না। ইহাতে যাহারা বিদ্যার্জন করিতে সত্য সত্যই আগ্রহী তাহারা যে বিস্তর ভোগান্তির শিকার হইতেছে, সে কথাতো বলাই বাহুল্য। এমনিতেই দেশে পাঠাগার সংস্কৃতি আজ নানান অবিমৃষ্যকারিতায় বিলুপ্তির পথে। উহার উপর আবার যাও দুই-একটি কানা মামারূপ পাঠাগার দেশের এখানে-সেখানে কোন প্রকারে টিকিয়া রহিয়াছে সেগুলিও অযত্নে-অবহেলায় আজ বিলীন হইতে বসিয়াছে।

দেশের শীর্ষ বিদ্যাপিঠের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটিই যখন কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় এইরূপ বেহাল অবস্থায় থাকে তখন অন্য পাঠাগারগুলির আসলে কি দশা উহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। আধুনিক প্রযুক্তি এবং সমাজে প্রকৃত শিক্ষার প্রতি অবহেলাজনিত কারণে গ্রন্থাগার বা পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়াছে এমনটি যাহারা মনে করেন তাহারা হয় মূর্খ না হয় জ্ঞানপাপী। পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা মানব সমাজে ফুরাইয়া যাইতে পারে না কোনদিনই। কেননা ঐ পাঠাগারে মলাটবন্দি অজস্র পুস্তকের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা, উন্নতি এবং সর্বোপরি মুক্তির দিশা রহিয়াছে। সুতরাং পাঠাগারের আবেদন ও প্রয়োজন কোনদিনই ফুরাইবার নহে। এই সত্যকে উপলব্ধিপূর্বক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও জাতীয় গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা বৃদ্ধিসহ অবকাঠামো সুবিধা বাড়াইতে কর্তৃপক্ষ তৎপর হইবেন, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।